নষ্ট মেয়ে

সুমিত্রা ঘোষ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ওঁম জবাকুসুম সংকাশন
কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্
ধন্তারিং সর্বপাপঘ্ন
প্রণোতোস্মী দিবাকরম।
ওঁম ঘৃণী সূর্য্যায় নমঃ, ও ঘৃণী সূর্য্যায় নমঃ,
ওঁম ঘৃণী সূর্য্যায় নমঃ।

আকাশ মেঘলা। সকালবেলায় উঠে সূর্যকে না দেখলে মন খারাপ হয়ে যায় সুনন্দার। সেই ছোটোবেলা থেকে ঘুম ভেঙে উঠে সূর্য প্রণাম করে দিন শুরু করার অভ্যেস ধরিয়ে দিয়েছিল ঠামা। সেই থেকে অভ্যেসটা আঁকড়ে রেখেছে ও। সকালে উঠে আকাশের দিকে তাকিয়েই বুঝেছে বৃষ্টিও হবে আজ। কালো জলভরা মেঘেরা একের পর এক মিছিল করে যাচ্ছে আকাশপথে। তবে, ঠিক এই সময় সূর্যঠাকুর আকাশের ঠিক কোনখানটায়, থাকেন জানে ও। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই স্থান লক্ষ্য করে চোখ বন্ধ করে প্রণাম সেরে চোখ খুলতেই দেখে মেঘের পর্দাটাকে দুফাঁক করে এক পলকের জন্য মুখ দেখালেন সূর্য। মনটা ওমনি খুশি হয়ে ওঠে ওর। বাথরুম ঘুরে তাড়াতাড়ি নীচে কিচেনে নেমে আসে। সকালবেলাটা আর পাঁচটা বাড়ির বউদের মতোই ব্যস্ত থাকে আলিপুরের মুখার্জি ম্যানশনের একমাত্র পুত্রবধ সুনন্দা মুখার্জি। ওকে এবাড়িতে কেউ বলেনি—'তুমি কিচেনে যাও।' কিচেন সামলাবার জন্য বাবুর্চি আছে, বাবুর্চির সাহায্যকারী আছে। এই দায়িত্বটা ও স্বেচ্ছায় নিয়েছে আর নিয়ে দেখেছে এবাড়ির লোকেদের ওর প্রতি ভরসার মাত্রাটা যেন আরও বেড়েছে। ও বিছানা ছেড়ে ওঠার আগেই তথাগত বেরিয়ে যায় জগিং করতে। ওদিকে শ্বশুর সিদ্ধার্থ মুখার্জি, আর শাশুড়ি ইন্দ্রাণীও বেরিয়ে যান। তথাগত অনেক চেষ্টা করেও বউকে ঘুম থেকে তুলে ভোরবেলায় দৌড় করাতে পারেনি। এখন বুঝে ফেলেছে রায়চৌধুরি বাড়ির মেয়েটি একটু অন্য জাতের মানুষ। আধুনিকা আবার কিছু কিছু ব্যাপারে একেবারেই অনাধুনিকা। ভোরে ওঠা ওর সম্ভবই নয়। প্রায় সাড়ে ছটায় উঠে কি যে সব সূর্য প্রণাম করবে তারপর বাড়ির পূর্বদিকে মন্দিরে প্রণাম করবে, পুরুতঠাকুরের সঙ্গে কথা বলে কিছু সময় নষ্ট করে কিচেনে গিয়ে ঢুকবে। তথাগতর প্রথম প্রথম বউকে

বঝতে একটু অসুবিধে হত। পরে বুঝেছিল দার্জিলিং লরেটো, প্রেসিডেন্সি কলেজ, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করা বউ একটা পা পুরনো জগতে আর একটা পা বর্তমান জগতে রেখে চলতে চায় ও চলে। ওর খারাপ লাগে না এখন আর বরং বাবুর্চি, হাউসকিপারে অভ্যস্থ জীবনে এক অন্য স্বাদ এনে দিয়েছে ওর বউ। একধরনের বন্ধন। নকল সাহেবি আনা থেকে কিছুটা মুক্ত গেরস্ত গেরস্ত ভাব শুধু ওর নয়, মা ইন্দ্রাণী আর বাবা সিদ্ধার্থরও বেশ পছন্দ হচ্ছে। সুনন্দা এবাড়িতে বউ হয়ে আসার পর থেকেই মম্—ড্যাডের সঙ্গে তথাগতর ইন্টিমেসি অনেক বেড়েছে। আগে যেন অনেকটা ফরমাল রিলেশন ছিল। কেউই কারও খুব কাছে আসতে পারত না। কেউ কারও মনের খবর রাখত না। জানার চেষ্টাও করত না। যে যার নিজের জগৎ নিয়ে ব্যস্ত থাকত ওরা। সুনন্দা এসে ধীরে ধীরে ওদের সকলের জন্য একটাই জগৎ তৈরি করে ফেলেছে। অতি সুন্দরী বউ-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা আর ভালবাসা—দুটোর রশিতেই বাঁধা হয়ে আছে মুখার্জী অ্যান্ড মুখার্জি ইন্টারন্যাশনালের তৃতীয় কর্তা তথাগত মুখার্জি।

পুরুত মশাইর পুজোর সময়টা বাড়ির ছোটো মন্দিরে উপস্থিতি সেরে কিচেনে এসে ব্রেকফাস্টের ফরমাশ, ডোনার স্কুলের টিফিন, জগিং-ওয়াকিং থেকে ফিরে আসার পর মম-ড্যাড আর তথাগতর জন্য আলাদা আলাদা জুস, দুপুরের লাঞ্চের মেনু—সব কাজেই কিছুটা ইনস্ট্রাকশন আর কিছুটা নিজে হাত লাগিয়ে করার প্রাত্যহিক কাজগুলো শেষ করে অবশেষে ওপরে নিজের বেডরুমে আসার সময় হয় নন্দুর ওরফে সুনন্দার। রুনা ওর টেবিলে ডাক রেখে গেছে। চিঠিপত্র দেখতে গিয়ে খুশির হাসি ফুটে ওঠে মুখে। ডিব্রুগড় থেকে ঠামার একটা চিঠি এসেছে। ঠামাবুড়ি এই মোবাইল—ইন্টারনেটের যুগেও আঁকাবাঁকা হাতে চিঠি লেখে ওকে। নিজের চারছেলে আর নাতিরা যদি ঠামার বুকে পঞ্জরাস্থি হয় একমাত্র নাতনি নন্দু তাহলে পঞ্জরাস্থির ভেতরে অবস্থিত হৃৎপিণ্ডের ধকধক।

আমার আদরের নন্দরানি,

প্রথমেই আমার আদর নিও। বাড়ির সবাইকে আমার আশীর্বাদ দিও। আশাকরি সকলে কুশলে আছ। সামনে দুর্গাপূজা আসছে। ইচ্ছা করে সবাই একসাথে এখানে আসুক কিন্তু কেউ আমার কথা ভাবে না। আমি মরলে সবাই একসাথে আসবে হয়তো। শুধু আমি সেটা দেখে যেতে পারব না। নন্দরানি তোমার ছোটোবেলার বন্ধু অপুকে মনে আছে? সেই যে নবীন ব্যানার্জি আর লক্ষ্মীর ছোটোমেয়ে? বিশ বছর পর সেই অপু ওর ননদের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে জন্মভূমি দেখতে এসেছিল। এসে হোটেলে উঠেছিল। আমি গাড়ি পাঠিয়ে বাড়িতে এনে তুলেছিলাম। প্রায় পনেরো দিন ছিল। আমাদের চা-বাগানে গেল, সারা পাড়ায় সকলের সঙ্গে দেখা করল। নিজেদের বাড়ির চারপাশে ঘুরল। হিমসাগর আমের গাছটার নীচে বসে অনেক কাঁদল। বারবার বলল—'ডিব্রুগড় থেকে চলে গিয়ে মা খুব ভুল করেছিল ঠামা। আমরা খুব কষ্টে ছিলাম কোলকাতায়।' তোমার কথা বলতে বলতে অভিমান করত—'নন্দু আমাকে ভুলে গেছে ঠামা।' অপু তোমার ফোন

নম্বর-ঠিকানা সব নিয়ে গেছে। যাবে তোমার বাড়িতে। একটু সাবধানে মেলামেশা করো। ছোটোবেলায় তোমাকে ভালোওবাসতো আবার খুব হিংসেও করত। তোমার সেসব মনে আছে কিনা জানি না। মহা মতলবি মেয়ে অপু, তাই সাবধান করে দিলাম। সবাই কুশলে মঙ্গলে থেকো। ইত্যাদি---। চিঠিটা হাতেই নন্দু জানালার সামনে এসে দাঁড়ায়। অপু। — মনটা পিছন ফিরে স্মৃতির রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করেছে। রায়চৌধুরি ভিলার একপাশে একরকম চারটে বাড়ি। মেহেন্দি গাছের ঝাড় দিয়ে পাঁচিল করা হয়েছে। তারই একটাতে থাকত অপুরা। নন্দুর থেকে ছমাসের বড়ো অপু। ওর বাল্যের সখী। কী দুষ্টুই না ছিল অপুটা। নন্দু কী ওকে ভুলতে পারে?। ঠামা বলেছিল দাদু নাকি ওই চারটে বাড়ি বানিয়ে রেখেছিলেন এই কথা ভেবে যে, যদি কখনও বাবা আর জেঠুদের মধ্যে বনিবনা না হয় তাহলে যেন ওরা ওই বাড়িগুলোতে থাকতে পারেন। তাহলে ওনারা আলাদাও থাকতে পারবেন আবার একই বাড়ির কম্পাউন্ডের ভেতর দাদুর চোখের সামনেও থাকবেন। কি আশ্চর্য মনঃস্তত্ত্ব আর দূরদৃষ্টি। কিন্তু দাদুর ভয়কে অহেতুক প্রমাণ করে বাবা—জেঠুরা চিরকাল এক সঙ্গে দাদু-ঠামার আন্ডারে বড়ো বাড়িতেই কাটিয়ে দিয়েছেন। ঠামা বলত—'তোরা তখনও জন্মাসই নি! আরে, 'তোর বাবাই তখনও জন্মায়নি রে। তোর দাদু অত বড়ো মানুষ হলে কি হবে, মাথাটায় একটু গোলমাল আছে, বুঝলি? তা নাহলে কেউ ছেলেরা যদি কখনও আলাদা হয়ে যায়, একথা ভেবে আগে থাকতেই চারখানা বাড়ি বানিয়ে রাখে? আমি বেঁচে থাকতে ওদের কখনও আলাদা হতে দেব আমি? তোর দাদুর সব আশঙ্কাকে মিথ্যে করে দিয়ে আমার চার ছেলে— চার বউ সারাজীবন সুখে দুঃখে একসঙ্গে কাটিয়ে দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তোর দাদু ওই বাড়িগুলোতে অন্য লোককে থাকতে দিল। মানে ভাড়া দিল। বেশির ভাগই সায়েব দের ভাড়া দিত। ওরা তো কারও সাতে-পাঁচে থাকত না, বাড়ি সুন্দর করে রাখত আর দু-তিন বছর পর বদলি হয়ে অন্য জায়গায় চলে যেত। তোরা সে সব দিন দেখিস নি। জানিস, তখন বাঙালি, অসমীয়াদের থেকে রাস্তাঘাটে গোড়া সাহেব-মেম বেশি দেখা যেত, চা বাগানের মালিক তো একচেটিয়া ওরাই ছিল। ওদের মধ্যে আমার শ্বশুর ছিলেন একমাত্র বাঙালি যার তিনখানা বড়ো চা-বাগান ছিল। তারপর তোর দাদু আবার দুটো বাগান কিনেছিলেন পরে।'— ঠামা গল্প বলত আর সুনন্দা হাঁ করে বসে শুনত। ঠামার বলা যে কোনো গল্পই ওর শুনতে খুব ভালো লাগত। এ বাড়িতে এই জেনারেশনে সুনন্দাই একমাত্র মেয়ে। জেঠুদের সকলের ছেলে, কারও মেয়ে নেই। একটি মাত্র মেয়ে তারপর সকলের ছোটো বলে বাড়ির সকলের আদরের ঘটা একটু বেশিই ছিল ওর প্রতি। ঠামার কথা তো বলাই বাহুল্য। নিজের বাবার জন্মেরও আগের ঘটনা যেন ইতিহাস বলে মনে হত ওর কাছে। আর ঠামার বলার ধরনটাই এমন ছিল যে মুগ্ধ হয়ে শুনত সুনন্দা।

একদিন এমনি গল্প করবার সময় ঠামা অপুদের আসামে আসার গল্প করছিল। অপুর

বাবা নবীনচন্দ্র ব্যানার্জি একজন ইলেকট্রিশিয়ান ছিলেন। ভালোকাজ জানতেন। কোনও ডিগ্রি ডিপ্লোমা কিছুই ছিল না ওনার। কি করে যে শিখেছিলেন সে কথা ঠামাও জানে না। নবীন ব্যানার্জি ভাগ্য অন্বেষণে সুদূর কোলকাতা থেকে আসামের ডিব্রুগড়ে এসে ঠেকলেন। ঠামার শ্বশুর অর্থাৎ সুনন্দার দাদুর বাবার সঙ্গে কি ভাবে যে যুবক নবীনের পরিচয় হয়েছিল তাও ঠামা জানে না। তবে নবীন ব্যানার্জিকে একেবারে ঘরের ছেলে বানাতে বেশি দেরি হয়নি কেশবনারায়ণ রায়চৌধুরির। নবীনকে ডিব্রুগড় শহরের মার্কেট অঞ্চলে একটি ঘর ভাড়া করে দিলেন ইলেকট্রিকেল জিনিষপত্র রিপেয়ারিং করার জন্য। নবীন নিজের পরিশ্রম আর কেশবনারায়ণের সহায়তায় ধীরে ধীরে মোটামুটি একটা ব্যাবসা দাঁড় করিয়ে ফেলেছিলেন। দোকান ঘরেই থাকতেন, নিজের হাতে রান্না করে খেতেন। কপর্দক শূন্য নবীন যখন কয়েক বছরের মধ্যে বেশ জমিয়ে ফেললেন ব্যাবসা তখন কেশবনারায়ণই নাকি ওনাকে বলেছিলেন— নবীন এবার বিয়ে করে সংসারী হও। পরিবার প্রতিপালন করবার মতো রোজগার তো করছ। আর কতকাল নিজে রান্না করে খাবে? -কেশবনারায়ণকে নবীন প্রায় ভগবান জ্ঞানে পুজো করতেন মনে মনে। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের ব্রাহ্মণ সন্তান নবীন, কেশবনারায়ণের মতো খ্যাতনামা ধনী ব্যক্তির সংস্পর্শ, স্নেহ, মমতা এবং সহায়তা পেয়ে বুঝেছিলেন স্বয়ং ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই ঘটনাগুলো ঘটছে। কেশবনারায়ণের প্রত্যেকটি নির্দেশকেই উনি বেদবাক্য মেনে নিয়ে গুরুত্ব দিতেন। বজবজের কাছে নিজের গ্রামে গিয়ে বিয়ে করে নিয়ে এলেন নবীন। বাসা ভাড়া নিয়ে সংসার পাতলেন ওরা। ঠামা বলত—'নবীনের বউ লক্ষ্মী কখন যে আমারও কাছাকাছি এসে গেল ওর স্বভাবগুণে, সে আমিও বুঝতে পারিনি জানিস? নতুন বউ হয়ে এসেছিল যখন, তখন এবাড়িতে, এলে আড়ষ্ট হয়ে থাকত। এ বাড়ির ঐশ্বর্য, বৈভব, আদবকায়দা সবই তো অন্যরকম ছিল। সাহেবিআনা ছিল কিছুটা। প্রথম প্রথম লক্ষ্মী এসে খুব ভয়ে ভয়ে থাকত। গ্রামের মেয়ে, গরিব মানুষ, ওরা তো এসব দেখেনি কখনও! রায়চৌধুরি বাড়িতে তো নবীন-লক্ষ্মীদের মতো অতি সামান্য মানুষের আসা-যাওয়া ছিল না কখনও। কিন্তু আমার শ্বশুরের, নবীন ব্যানার্জির ওপর অগাধ বিশ্বাস আর স্নেহ ওদের দুজনকে এ বাড়িতে যখন তখন আসা যাওয়া করার ছাড়পত্র দিয়েছিল। তোর বাবা যখন আমার পেটে, তখন লক্ষ্মীরও বাচ্চা হবে। তোর বাবা আর লক্ষ্মীর বড়োমেয়ে যুথীকা একসমান, ৬ মাসের ছোটোবড়ো ওরা। আদিত্যর পরে আমার তো আর ছেলেপুলে হয় নি, কিন্তু লক্ষ্মীর একের পর এক বাচ্চা হতে লাগল। ওরা যে দশ ভাই বোন সে তো তুই জানিস। আর চার ছেলের পর আমার আর মেয়ে হলই না।

এসব শুনে সুনন্দারও হাসি পেত। যুথীপিসি ওর বাবার সমান আর যুথীপিসির সবচেয়ে ছোটো বোন অপু ওর সমান। আগেকার দিনের লোকগুলোর সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা কি সাংঘাতিক প্রবল ছিল! পুরনো দিনের স্মৃতি ঘাঁটতে ঘাঁটতে আলিপুরের বাড়ির

জানালায় দাঁড়িয়ে আপন মনেই হাসল নন্দু। ওর দাদু তো কেশবনারায়ণের মৃত্যুর পর নবীন ব্যানার্জিদের ওই চারখানা বাড়ির একখানা বাড়িতে নিয়ে এসে বসালেন। অপুর জন্ম এই অভিজাত রায়-চৌধুরি বাড়িরই কম্পাউন্ডের ভেতরে হয়েছিল। আর এর ছমাস পর নন্দু জন্মেছিল। ঠিক নন্দুর বাবা আদিত্য নারায়ণ আর অপুর বড়দি যুথীকার মতো।

শেষ বয়সের সবচেয়ে ছোটো মেয়ে অপু তাই আদরে, প্রশ্রয়ে প্রায় জংলি হয়ে বড়ো হচ্ছিল। অপুরা সাতবোন, তিনভাই ছিল। যুথীকা, মল্লিকা, মাধবীর পর প্রথম ছেলে বাদল কাকু, তারপর আবার টগর পিসি, বেলি পিসির পর, সজলকাকু, এরপর কেয়া পিসি, কাজলকাকু, এবং সবচেয়ে শেষে অপরাজিতা ওরফে অপু। নবীন ব্যানার্জি আর ওর স্ত্রীকে জ্ঞান হয়ে নন্দু যখন থেকে দেখেছে তখন তো ওনাদের বুড়ো মানুষই বলা যায়। ও ওদের দাদু—দিদা বলেই ডাকত। একমাত্র লক্ষ্মী দিদা আর অপু ছাড়া অন্য কোনো ছেলে মেয়েরাই বিনা প্রয়োজনে কখনও রায়চৌধুরিদের মূল বাড়িতে আসত না। কেন আসত না তা নন্দু সেই ছোটো বেলায় বুঝতে পারত না। এখন ওর মনে হয় যে এ বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ওদের বাড়ির যে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক একটা বিশাল গ্যাপ রয়েছে সেটা ওরা জানত বলেই বোধহয় কখনও এবাড়িতে আসত না। বোধহয় বুঝত যে এমন একটা বাড়ির একপাশে একটি সুন্দর আলাদা বাড়িতে যে ওরা থাকতে পারছে, সেটা শুধুমাত্র ওই বড়োবাড়ির লোকেদের অনুগ্রহ ছাড়া কিছু নয়। লক্ষ্মীদিদার কিন্তু দিনের অধিকাংশ সময় এ বাড়িতেই কাটত। সুনন্দা ছোটোবেলায় দেখেছে লক্ষ্মীদিদা এ বাড়িতে কুটনো কুটে দিচ্ছেন, কখনও ঠামার চুল বেঁধে দিচ্ছেন, কখনও ঠামার খাটের ওপর দুজনে বসে পান সেজে খাচ্ছেন আর গল্প করছেন। আর অপু তো শোবার সময়টুকু ছাড়া এ বাড়িতেই পড়ে থাকত। সুনন্দার খাসিয়া আয়া একসঙ্গে অপু আর সুনন্দাকে প্রায় দিনই খাইয়ে দিত। আর একটা কারণও হতে পারে। এ বাড়িতে তো একমাত্র নন্দু ছাড়া বাকি সবাই ছেলে। আর এবাড়ির ছেলেরা ৪-৫ বছর বয়স থেকেই দার্জিলিং-এর সেন্ট পলস স্কুলে পড়তে চলে যেত। শুধু শীতের সময় তিনমাসের লম্বা ছুটিতেই ওরা বাড়ি আসত। দার্জিলিং-এর স্কুলের পাট চুকলে ওরা যেত শিলংয়ের সেন্ট এডমন্ডস কলেজে পড়তে। ওদিকে নবীন ব্যানার্জির ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো শুরু হত সরকারি প্রাইমারি স্কুল থেকে আর শেষ হয়ে যেত সরকারি হাইস্কুলের ক্লাস সিক্স থেকে সেভেনের মধ্যেই। একমাত্র যুথীকাপিসিই নাকি ও বাড়িতে ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন। এখন সুনন্দার মনে হয় ওরা একধরনের হীনম্মন্যতায় ভুগত বলেই এবাড়ি থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করত। রায়চৌধুরি বাড়ির কারোরই অহংকারী বলে বদনাম ছিল না কখনও। অহংকারী হলে এবাড়ির গেট্ পেরিয়ে ঢোকার অনুমতি নবীন ব্যানার্জির পরিবার কোনোদিনই পেত না। তবু ওরা কখনও আসত না কোনো উপলক্ষ্য ছাড়া।

অপু ছিল এক দুরন্ত মেয়ে। যার মেয়ে হয়ে না জন্মে বরং ছেলে হয়ে জন্মালে ভালো হত। নন্দু নিজেও দুষ্টু ছিল, তবে ওই বয়সে যেরকম সবাই হয় ততটুকুই। অপুর থেকে